Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 09-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

'আল ফারুক' এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকণে এর তাৎপর্য

মোহাঃ ইয়াকুব
গবেষক, আরবী বিভাগ, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ভারত

Abstract

Allamah Shibli Nomani was a great Islamic Scholar, an outstanding literary figure of nineteenth century India. He was an erudite intellectual, reputed historian and biographer, a versatile writer, litterateur and a poet. Besides, he was a serious and dedicated researcher who went deep to fine out the correct facts, assess reality and expose them to the world to understand the truth. He was a shining star who illuminated the path of knowledge as well as the hearts and minds of young generations to help them understand the world correctly particularly of Muslims and their heritage. He had not only written history but also created history through his works and writings. All of his works are famous and impress academicians worldwide. Two of them, Seerat –un- Nabi and Al-Farooq are most popular, read and appreciated by scholars and even the common people.

Al-Farooq is a landmark in the history of biography and a magnificent piece of Islamic Literature. It is the vivid narration of the personality of Umar Farooq, the second Caliph of Islam and his role in implementing the Islamic system in its true sense and providing it with stability and solidity. Shibli explored the personal attributes of Umar Farooq, his character, dedication and commitment to Islam as well as his administrative and organizational abilities that made him an important figure in Islamic history.

Keywords: Indian Scholars, Allama Shibli Nomani, His Famous Books, Al-Farooq.

আল্লামা শিবলী নোমানী ঊনবিংশ শতকে ভারতের এক অসামান্য সাহিত্যিক এবং একজন মহান ইসলামিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, জীবনীকার, এক বহুমুখী লেখক, সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন একনিষ্ঠ গবেষক ছিলেন, যিনি সঠিক তথ্যগুলি সূক্ষ্মভাবে দেখতে এবং বাস্তবে তার মূল্যায়ন করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি একটি উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন যিনি জ্ঞানের পথের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের হৃদয় ও মনকে আলোকিত করেছিলেন যাতে তারা বিশ্বকে বিশেষত মুসলমানদের এবং তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তিনি তাঁর রচনাগুলির মাধ্যমে একাডেমিক জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তিনি কেবল ইতিহাসই রচনা করেননি বরং তিনি তাঁর রচনা ও লিখার মাধ্যমে ইতিহাসও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমস্ত কাজ বিখ্যাত এবং বিশ্বব্যাপী একাডেমিকদের মুগ্ধ করে। এর মধ্যে দুটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পেয়েছে। একটি হল সিরাত-উন-নবী ও অপরটি হল আল-ফারুক।

আল-ফারুক জীবনী ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী এবং ইসলামী সাহিত্যের একটা দুর্দান্ত অংশ। এটি ইসলামী ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক (রাঃ) এর ব্যক্তিত্বের বিশদ বিবরণ এবং তাঁর সত্যিকার অর্থে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ণে এবং স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা প্রদানে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। শিবলী উমার ফারুকের (রাঃ) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁর চরিত্র, নিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি তাঁর প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতা অনুসন্ধান করেছিলেন যা তাঁকে ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

বইটি মূল উর্দুতে রচিত এবং ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এরপর থেকে এর বহু সংস্করণ ছাপা হয়েছে। এটি উমর ফারুক (রাঃ) এর জীবনকাল, তাঁর আমলের পরিস্থিতি, তাঁর প্রশানিক এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং বুদ্ধিমান আলেম ও জ্ঞানী মানুষের সমস্যাগুলি মোকাবিলায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এবং তারা বইটি অনুবাদ করার জন্য জরুরি অনুভব করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বইটি কয়েকটি ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে, বিশেষত তুর্কি, ফার্সি, আরবী এবং ইংরাজিতে। তুর্কি ভাষাতে অনুবাদ করেছিলেন 'উমর রাদা' যিনি এটি ১৯২৮ সালে ইস্তম্বুল থেকে প্রকাশ করেছিলেন। ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন নাদির শাহের বোন এবং কাবুল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আর আমরা জানি যে, ইংরাজি ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছিল ১৯০০ সালে একজন প্রখ্যাত লেখক 'মাওলানা জাফর আলী খানের' দ্বারা কিন্তু বইটির কেবল প্রথম অংশই অনুবাদকৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বইটির দ্বিতীয় অংশটি 'মুহাম্মাদ সেলিম' ইংরাজিতে অনুবাদ করেন এবং ১৯৫৭, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়।

বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আরবের ইতিহাসের প্রকৃতি, এর উৎস ও বিকাশ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। লেখক ইতিহাসের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তারা কীভাবে পুরাতন ঐতিহাসিক কার্যাবলীকে অবহেলা করেছিলো। তিনি নির্দিষ্ট নিয়মে একটা পর্যাপ্ত পদ্ধতিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন যা সঠিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে লক্ষ করা উচিত। তদুপরি, তিনি উমর ফারুকের জীবনী, তাঁর পারিবারিক পটভূমি, তাঁর প্রশিক্ষণ এবং তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন যা তাঁকে সাহসী করেছিলো এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে পরিমার্জনা করেছিলো। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ, মদিনায় হিজরত, যুদ্ধে অংশ নেওয়া, তাঁর বিজয় এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেছিলেন যা আমরা কখনও ইতিহাসে দেখিনা।

দ্বিতীয় খণ্ডটি দ্বিতীয় খলিফার সক্ষম নেতৃত্বে বিশালাকারে বিজয় এবং ইসলামিক রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা তুলে ধরে। পশ্চিমা ঐতিহাসিক যিনি নেতৃত্বের কৃতিত্বকে ক্ষুন্ন করেছিলেন, পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং চোষর সাম্রাজ্য উভয়ের দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার ইসলামিক বিজয়কে দায়ী করেছিলেন। আল্লামা শিবলী এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এই সমস্ত সাম্রাজ্যের সৈন্যরা আরো ভালো অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল এবং দক্ষ ছিল। তিনি আরো বলেন, মুসলিম বিজয়ের আসল কারণ হল, উৎসাহ, অটলতা, সাহস এবং উৎসর্গ যা নবী অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে দিয়েছিলেন এবং উমর ফারুক (রাঃ) যেটা পরবর্তীকালে অনুসরন করেছিলেন। লেখক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন, প্রশানিক ও শাসন ব্যবস্থা স্থাপনার এবং তাদের সুচারুভাবে পরিচালনার পাশাপাশি জনগণের প্রয়োজনও কল্যাণে নিখুঁত আগ্রহ এবং উৎসর্গের বিশদ বিবরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উমর ফারুকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধিক অনুসরণ, প্রজ্ঞা,

বিশ্বাসের প্রতি প্রতিশ্রুতি, তাৎপর্য, সরলতা, সাম্যতা এবং ব্যক্তিগত ও জনসাধাণের জীবনে ন্যায়বিচার বজায় রাখার বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন।

বইটির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য: আল-ফারুক বইটি বিভিন্ন দিক থেকে বিখ্যাত। এটি একটি ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক রচনা যা কোনও ভয় ও পক্ষপাত ছাড়াই সত্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সঠিক পরিস্থিতির বর্ণনা করে। এটি ইসলামী বিশ্বের একটি মহান ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট বিবরণ সহ দুর্দান্ত জীবনী। এটি সবচেয়ে মার্জিত শৈলীতে বর্ণিত সাহিত্যের একটি দুর্দান্ত অংশ। তদুপরি এটি ইসলামী সমাজ, এর বিভিন্ন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, শক্তিগুলির যথার্থ ও খাঁটি চিত্র হিসাবে চিত্রিত করে কারণ এটি ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করে এবং অনিষ্টকারীদের এড়িয়ে চলা জনকল্যাণে এর উদ্বেগকে যথাযথভাবে চিত্রিত করে। বইটির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়:

- ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
- রাষ্ট্রীয় শাসনে নাগরিকদের অংশ গ্রহণ
- মানব সম্পদের উন্নয়ন
- ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মাধ্যমে আসা পরিবর্তন
- ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি

ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য: শিবলীর ঐতিহাসিক এবং জীবনী রচনার একটি উপলব্ধি দেখায় যে এগুলি নির্দিষ্ট নীতিগুলির ভিত্তিতে এবং উদ্দেশ্যে রচিত যা ঐতিহাসিক ঘটনার পুরো বিবরণ এবং বিশ্লেষণে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর লেখার প্রথম ভিত্তি হল, সমাজের অবস্থা, ইসলামী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ, সংস্থার বিকাশ এবং মানুষের উপর তাদের প্রভাবসহ ইসলামিক বিশ্বের সঠিক, প্রকৃত ও সত্য প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করা। পাশ্চত্য ঐতিহাসিকরা মিথ্যা বর্ণনা করে এবং সত্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের, তাদের অবস্থা, তাদের নেতা ও বিশ্বাস সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এবং ভুল ধারণা তৈরি করেছিলেন। তারা সর্বদা মুসলিম নেতৃত্বের ভাল গুণাবলী এবং তাদের সংগঠনের উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আড়াল করে। শিবলী মুসলিম সমাজ সম্পর্কে এই ভুল বোঝাবুঝি এবং সত্যের হেরফের সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ) এবং খালিফাদের শাসনকাল এমন এক সোনালী সময় ছিল, যেখানে মানব জীবনের সর্বস্তরে সত্যিকার অর্থে ইসলাম বাস্তবায়িত হয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতা এবং পরবর্তীকালে মুসলমানদের যে হতাশা এবং হীনমন্যতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা দূর করা। ১৮৫৭ সালের পর থেকে মুসলমানরা চরম হতাশা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। শিবলী চেয়েছিলেন তদের ঐতিহ্যের মহিমা এবং ইতিহাসের রাজত্বকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বংশধরের ভূমিকা উপলব্ধির মাধ্যমে তারা এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসুক। বইটি মুসলমানদের মধ্যে নতুন উদ্যোগের সঞ্চার করেছে।

আল-ফারুক বইটিতে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে ইসলামী সমাজ এই অঞ্চলে তাঁর মূলকে শক্তিশালী করেছে, স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে এবং উমর ফারুকের সক্ষম নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিকশিত করেছে। খলিফা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, তা ছিল পর্যাপ্ত। তিনি নিয়মতান্ত্রিক ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করার চেষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একটি শো'রা সিস্টেম অর্থাৎ পরামর্শমূলক সমাবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হত এবং সকলের মতামত নেওয়া হত ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। সেই সময়

মুসলমানদের দুটি বড় গ্রুপ ছিল মুহাজির ও আনসার যারা আরবের জনসংখ্যা গঠন করতো। আনসারদের আরও দুটি উপজাতি গোষ্ঠী ছিল আউস এবং খাজরাজ। এদের সবার বিধানসভার সভাগুলিতে উপস্থিত থাকা অপরিহার্য ছিল। সাধারণত প্রার্থনার জন্য লোকেদের ডেকে অ্যাসেম্বলির সভা ডাকা হত। লোকেরা যখন নবীর মসজিদে জড়ো হত, খলিফা তখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং তাদের সাথে দুই রাক'আত নামাজ পড়তেন। এরপর তিনি সমাবেশকে সম্বোধন করতেন এবং বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধভাবে উপস্থাপন করতেন। মূলত, এই সভায় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, মুহাজির ও আনসারদের সাধারণ পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হত। যার ফলে খালিফার দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও মামলাগুলির ন্যায়বিচার ও নিষ্পত্তি করা যেত। এছাড়াও আরও একটি কাউন্সিল ছিল যেখানে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। সাধারণত খলিফা তাঁর সভাতে জেলা ও প্রদেশে নিযুক্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা আগত প্রতিবেদনগুলি নিয়েই আলোচনা করতেন। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত সেটা হল যে রাজ্যটি জনগণের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে পরিচালিত হত, একজনের ইচ্ছায় নয়। সুতরাং, পরামর্শ ইসলামিক প্রশাসনের একটি অপরিহার্য শর্ত। উমর ফারুক (রাঃ) এ সত্যটি উপলব্ধি করে বলেছিলেনঃ "পরামর্শ ছাড়া খিলাফত নেই"। আল্লামা শিবলী নোমানী 'কুনিজ-উল-উম্মতের' নির্ভরযোগ্য উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সত্যটি তুলে ধরেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় শাসনে নাগরিকদের অংশ গ্রহণ: একটি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই ভিত্তিতে গণতন্ত্র নামে একটি উন্নত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় নাগরিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে নীতি নির্ধারণ এবং কার্যকর করার জন্য পরিচালন কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার সমস্যাটি হল নাগরিকরা সরকার গঠনকারী প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে তাদের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখে না এবং প্রায়শই ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব স্বার্থে এবং তাদের দলের হয়ে কাজ করেন। শিবলী এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন যে, উমর ফারুকের গণতন্ত্র আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ইসলামীক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে শো'রা সিস্টেম ছিল এবং পরে এটিকে আরও কার্যকর করা হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন স্তরে পরামর্শমূলক সংস্থাগুলি সংগঠিত করেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ এবং তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতেন, সদস্যদের মতামত চেয়েছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি একটি অনন্য ঘটনা ছিল কারণ তৎকালীন রাজ্যগুলি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ছিল যেখানে সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল যিনি তার মিষ্টি ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। রাজ্য প্রধান প্রশাসন পরিচালনার উপযুক্ত দক্ষতার পরিবর্তে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কয়েকজনকে নিয়োগ করতেন। সাধারণ পুরুষদের প্রশাসনের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তাদের আগ্রহকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হত। কর্মকর্তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণের যত্ন নেননি, বরং তারা নিজের স্বার্থে কাজ করেছিলো। এটি ছিল উমরের রাষ্ট্রনায়কত্ব, উৎসর্গতা ও বিশ্বাসের প্রতি প্রতিশ্রুতি যা পরে গণতন্ত্রের রূপ নেয়। নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেন। জনগণের সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও রাষ্ট্রের বিষয় পরিচলনা করেছিলেন। ফলস্বরূপ, প্রশাসন প্রতিটি নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ বিবেচনা করেছিল। প্রাদেশিক গভর্নর ও জেলা অফিসারগণ জনগণের সম্মতিতে এবং নির্বাচনের মাধ্যমেও নিযুক্ত হন। কুফা, বাসরা এবং সিরিয়ার রাজস্ব আধিকারিকদের নিয়োগের সময় উমর ঐসব প্রদেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে এমন

একটি ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন যাকে তারা সর্বাধিক সৎ ও যোগ্য মনে করেন। একবার এক জনৈক ব্যক্তিকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু লোকেরা তাঁর প্রশাসনের বিষয়ে অভিযোগ করলে তাকে সরানো হয়। খালিফার কোন বিশেষ সুযোগ ছিল না। তিনি অন্যের সাথে নিখুঁত সাম্য বজায় রেখেছিলেন। তিনি কোনও বিশেষ অধিকার উপভোগ করেননি, কোনও বিশেষ অধিকারের দাবিও করেননি এবং কখনও কোনও আইন থেকে ছাড় করেননি। তিনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি সাধারণ পুরুষদের মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁর বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। তিনি সর্বদা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাকে স্বগত জানান।

মানব সম্পদের উন্নয়ন: ইসলাম মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও গুণাবলীকে উদ্দীপ্ত করে। উপরিউক্ত গুণাবলী আমরা উমর ফারুক (রাঃ) এর শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমরের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী ছিল তা আভিজাত্যের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হত। বংশবৃত্তীয় টেবিলগুলি সন্ধানে তাঁর দুর্দান্ত দক্ষতা ছিল। তিনি এটি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি অ্যাথলেটিক এবং কুস্তিতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন। কুরাইশরা তাকে রাষ্ট্রদূতের পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন যা সাধারণত তাদেরকেই দেওয়া হত যাদের কথা বলার বিশেষ মানের ছিল এবং উচ্চ দক্ষতার কৌশল ছিল। এছাড়াও তিনি পড়া এবং লেখাতে সুনিপুণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এসব গুণাবলীর পরেও তিনি সত্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং 'চূড়ান্ত বাস্তবতার' সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি যখন কুরআনের কয়েকটি আয়াত শোনেন, তখন তিনি সেগুলি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি যখন পুরোপুরি একজন নতুন মানব হিসাবে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর মনের মধ্যে তপস্যা, ধার্মিকতা, প্রবণতা এবং আধ্যাত্মিকতা বিকাশ করেছিলেন তিনি নিজেকে মানুষের সীমাবদ্ধতার উর্ধে উত্থিত করেছিলেন এবং সৎকর্ম ও গুণাবলী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন আল্লাহর সেবায় এবং পৃথিবীতে তাঁর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সর্বদা রাসূলের সাথে তাঁর সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতেন, তাঁকে উচ্চ সম্মানে রাখতেন এবং তাঁর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর সাথে উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি একজন মহান বিজয়ী ছিলেন এবং তাঁর আন্তরিকতা, ক্ষমতা এবং কৌশলের কারণে তিনি এক বিস্তীর্ণ ভূমির উপর শাসন চালিয়ে ছিলেন। শিবলী দাবি করেছেন যে খলিফা মক্কা থেকে উত্তরে ১,০৩৬ মাইল, ১,০৪,৪৭৪ মাইল পূর্বে এবং দক্ষিণে ৪৮৩ মাইল, সিরিয়া, মিশর, খুজেস্তান, ইরাক, আর্মেনিয়া, অধরাইজান দেশ নিয়ে বিস্তৃত মোট ২,২৫১,০৩০ বর্গমাইল এলাকা জয় করেছিলেন। পার্স, কিরমান, খুরসান এবং মাকরান পাশাপাশি বেলুচিস্তানের কিছু অংশ। তাঁর বিজয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি হল তিনি কখনও জমি এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করেননি, নিরীহ মানুষকে কখনও হত্যা করেননি এবং নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের ক্ষতি করেননি। তিনি সর্বদা ন্যায়বিচার বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁর কমান্ডারদেরও এটি পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মাধ্যমে আসা পরিবর্তন: একটি মূল্যবান এবং গঠনমূলক মতবাদ হিসাবে ইসলাম একটি কার্যকর এবং ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থা যা জনগণ ও সমাজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। শিবলী নোমানী আল-ফারুকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে খালিফা ইসলাম গ্রহণের পরে নিজেকে

পরিবর্তন করেছিলেন এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল যা ব্যক্তিগত পদমর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। তিনি সারা জীবন জনগণের সেবা ও সমাজের উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি পুরো জীবন মানবতার সার্বিক উন্নয়নে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি সরকারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নীতিমালা রেখেছিলেন, প্রশাসনিক কাঠামো সংশোধন করেছিলেন, বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেছিলেন, তাদের কার্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তাদের হাতে নিজ নিজ দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন যেন তারা সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে। এই সমস্ত কাজ তিনি নিজের ব্যক্তিগত লাভ বা উদ্দেশ্যের জন্য নয় বরং আল্লাহর বিশ্বস্ত হিসাবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করে ছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি একটি পরোপকারী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন যেখানে একজন সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রের প্রধানকে প্রশ্ন করতে পারে, এবং তিনি মনোযোগ সহকারে অভিযোগগুলি শোনেন এবং সেগুলি অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন। এগুলি ছিল ইসলামের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা আমরা মানবজাতির পুরো ইতিহাসে পাই না।

খালিফা উমর (রাঃ) যে পরিবর্তনগুলি নিয়ে এসেছিলেন তা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে একটি পৃথক তাত্ত্বিক কাঠামোকে বোঝায়। এটি সাধারণত দেখা যায় যে সমাজের বৈষয়িক দিকটি পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল যা চূড়ান্তভাবে অ-উপাদানকে প্রভাবিত করে। সমাজবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পায়নের উদাহরণ দিয়েছেন। বিশেষ করে উৎপাদনের কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার এই সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলির জন্য বিভিন্ন মনোভাব, চিন্তাভাবনা, মানসিক সেটআপ এবং কাজের নৈতিকতার প্রয়োজন হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সকলের প্রতি সমান অগ্রাধিকার এসব নিয়েই সমাজ গঠিত হয়। ফলস্বরূপ যে ধর্মীয় নৈতিকতা নাগরিক নৈতিকতায় রূপান্তরিত হয় এবং আধুনিক সমাজগুলি তাদের প্যাটার্ন এবং কাঠামোতে এটি গ্রহণ করছে। ইসলাম এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে; ও জোর দিয়েছে যা জীবনের উদ্দেশ্য সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং যার চারপাশে মানব ও তাদের সমাজের অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঘুরছে। আমরা উদ্দেশ্যটিকে উন্নততর উপায়ে এটি পরিবর্তন না করার জন্য অর্জন করার উপায় বিকাশ করি। যদি কোনও ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ইসলামকে অনুসরণ করে তবে সে তার পরিবেশ ও আশেপাশে এমন পরিবর্তন আনতে পারে যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে এবং শান্তিতে ও সম্প্রীতিতে জীবনযাপন করতে পারে। কারণটি হল, সত্যিকারের মুসলমান এই পৃথিবীতে স্বার্থপর অভিপ্রায়ের জন্য কাজ করে না যা কেবলমাত্র সর্বোত্তম উপায়ের জন্য। তাঁর অনুরোধগুলি সন্তুষ্ট করার জন্যই নয়, কিন্তু বিশ্বজগতের কর্তার আদেশকে অনুসরণ করা এবং তাঁর মহিমান্বিতের সন্তুষ্টি অর্জনে খলিফা উমর ফারুকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মহান ইতিহাসবিদ শিবলী বিশ্বকে কী জানাতে চান তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

আল-ফারুক তাঁর পদ্ধতির নীতিগুলির জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ যা এখানকার ইতিহাস লেখার জন্য লেখকরা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন এবং যা তিনি একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রের্কড ও ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। 'আল-মামুন' বইটি তার একটি উদাহরণ। শিবলী অতীতের ঐতিহাসিকদের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যারা এই সময়ের শাসকদের জীবন সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন এবং জনগণের সামাজিক অবস্থার অবহেলা করেছিলেন। বাস্তবে ইতিহাসের নিজস্ব দর্শন রয়েছে যা এই বিজ্ঞানকে সমাজ বোঝার জন্য আরও প্রাসঙ্গিক ও দরকারী করে তোলে। এটি সেই শর্ত, ঘটনা ও ঘটনাগুলির বিবরণ এবং ব্যাখ্যা যার দ্বারা আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে রূপদানকারী শক্তি

হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এই কারণেই হাজাল (১৭৭০-১৮৩১) এবং মার্ক্সের (১৩৩২-১৪০৬) মতো দার্শনিকগণ ইতিহাসের গতিপথটি বোঝার জন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিকাশ করেছিলেন। শিবলীও ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) মতো ঐতিহাসিককে প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রসূ করতে চেয়েছিলেন। আর একারণেই তিনি সঠিক ইতিহাস লেখার এবং সত্যকে বোঝার পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনিই ইবনে খালদুনের পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি সত্যতা নির্ধারণ এবং ইতিহাসের প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইবনে খালদুন অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করার এবং ঐতিহাসিক শক্তি বোঝার জন্য একটি সমাজের বর্তমান অবস্থা অধ্যয়ন করা অনুভব করেছিলেন। তিনি সমাজে একত্রিত পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক পরিস্থিতি, শাসন, জীবিকা, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এমনভাবে পড়াশোনা করতে আগ্রহী ছিলেন যে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না। শিবলী সঠিক স্থানের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন যা এক জায়গায় প্রচলিত ছিল এবং নতুন ইভেন্টের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি এভাবে একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রেখেছিলেন যা সঠিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে পালন করা উচিত।

ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি: শিবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এমন একটি সমাজ বা স্থানের পুরো পরিস্থিতি বর্ণনা করা যেখানে পৃথক পৃথক ঘটনা ঘটেছিল। সুতরাং ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এবং সমাজে সত্যতা বোঝার ক্ষেত্রে তিনি একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। তিনি দুটি মৌলিক নীতি চিহ্নিত করেছিলেন যা ইতিহাস রচনায় অনুসরণ করা উচিত।

- ❖ নির্দিষ্ট কাল, স্থান এবং সমাজের সমস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলির পুরো অবস্থা বর্ণনা করা উচিত।
- ❖ ঘটনার বর্ণনায় কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্ক চিহ্নিত করা উচিত।

শিবলী নোমানী এই নীতিগুলির উপর ভালভাবে জোর দিয়েছেন যদিও ঐতিহাসিকরা অন্যান্য শাখাগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তারা নির্দিষ্ট কারণগুলি সংঘটিত হওয়ার কারণগুলি শনাক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন ইভেন্ট ও তাদের ক্রমগুলির মধ্যে লিঙ্ক খুঁজে পেয়েছেন। তিনি দেখতে পান যে, ইতিহাসে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, কিন্তু আমরা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে কিছুই তথ্য পাই না। ইতিহাসবিদরা যদি মর্যাদাপূর্ণ অনুশাসনের জ্ঞান রাখেন এবং সেই বিষয়গুলির আলোকে ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করেন তবে ইতিহাস আরও ফলদায়ক হবে।

ইতিহাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল ঘটনাগুলির সত্যতা এবং যথার্থতা মূল্যায়ন। ইভেন্টগুলি রেকর্ডে রাখার আগে যথার্থতা যাচাই করা দরকার। শিবলী একটি ইভেন্টের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন ঐতিহ্য এবং অনুপাত। ঐতিহ্যটি প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের মাধ্যমে কী ঘটনা ঘটেছে তার সন্ধান দেয়। আর অনুপাত হল ঘটনাগুলির জাতীয় মূল্যায়ন। শিবলী অনুপাতকে ঘটনাগুলির যথার্থতা বিচার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং একটি বর্ণনার যথার্থতা বিচার করার জন্য নিম্নলিখিত বিধিগুলি রেখেছিলেন।

- ✓ প্রকৃতির আইন অনুযায়ী ইভেন্টের সম্ভাবনা
- ✓ ইভেন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের প্রবণতা
- ✓ ইভেন্টের সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া ঘটনাটির অস্বাভাবিকতার সাথে সমানুপাত
- ✓ ঘটনাটির বিবরণীতে বর্ণনাকারী অনুপাত

- ✓ ইভেন্টের বিবরণ হল ইভেন্টের সঠিক প্রতিচ্ছবি

মূল্যায়ন: ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা শিবলী নোমানীর দক্ষতাকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। তিনি উর্দুতে বহু বই লেখেছেন। তারমধ্যে অন্যতম একটি বই হল 'আল-ফারুক'। এই বইটিতে তিনি কেবল ইসলামী ইতিহাসে দ্বিতীয় খালিফা উমর ফারুক (রাঃ) জীবনীই বর্ণনা করেননি বরং তাঁর জীবনীকে সামনে রেখে শাসনব্যবস্থার একটি বাস্তব পটভূমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যা আমাদের কাছে এক দৃষ্টান্তমূলক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থপুঞ্জি:

1. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল-ফারুক, মাতবু'য়ে মা আরিফ প্রেস, আজমগড়।
2. ড. সামির আব্দুল হামিদ ইব্রাহিম, আল-ফারুক, দারুস সালাম, রিয়াজ, ১৯৯৮।
3. মাওলানা জাফর আলী খান, আল-ফারুক-মহান উমরের জীবনী, কাশ্মীরী বাজার, লাহোর, ১৯৩৯।
4. মাওলানা সাঈদ সুলাইমান নাদবী, হায়াতে শিবলী, মাতবু'য়ে মাআরিফ প্রেস, আজমগড়, ২০০৮।
5. মাওলানা সাঈদ সুলাইমান নাদবী, মাকালাতে শিবলী, মাতবু'য়ে মাআরিফ প্রেস, আজমগড়, ২০০৮।